'স্ত্রীর পত্র' প্রসূন ঘোষ

১৩১৭ বঙ্গাব্দে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ পুত্র ও পুত্রবধূর সম্পর্কের বিষয়ে মত ব্যক্ত করে লিখেছেন : "তাঁকে মানুষ হিসাবে সমগ্রভাবে তোকে দেখ্‌তে হবে—কেবল গৃহিণী এবং ভোগের সঙ্গিনীভাবে নয়।... কেবলমাত্র নিজের রুচি, ইচ্ছা এবং প্রয়োজনের দিক থেকে প্রতিমাকে দেখলে হবে না—ওর নিজের দিক থেকে সম্পূর্ণ করে তুলতে হবে।" অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ নারীর পরিচয় সমাজপ্রদত্ত নির্মোক দিয়ে দেখতে চাননি, কিংবা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে কেবলমাত্র অধিকারবোধ কিংবা কামনাসর্বস্বতার দিক দিয়েও মেনে নিতে পারেননি, তিনি নারী এবং পুরুষকে ব্যক্তি হিসাবেই দেখেছিলেন; সুতরাং দাম্পত্য সম্পর্ককেও দু'জন স্বাধীনচেতা ব্যক্তির আন্তরিক-দায়বদ্ধ-সার্বিক তথা মানবিক সম্পর্ক হিসাবেই দেখেছিলেন। তিনি সর্বাধিক আহত হয়েছিলেন নারীর মর্যাদা লঙ্ঘনের ঘটনায়। সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র নারীর নিপীড়নকে নয়, তার মর্যাদা লঙঘনকে দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন, বাংলার সমাজ-সংসারে নারী কেবল সামাজিক বা পারিবারিকভাবে আহত হয় না, তার মর্যাদা প্রতিনিয়ত ক্ষুণ্ণ হয়। নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, তাদের পারস্পরিক অবস্থান ও অস্তিত্বের ক্ষেত্রে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয় রবীন্দ্র-ছোটগল্পে।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পের প্রথমে মৃণাল কলকাতার সাতাশ নম্বর মাখন বড়াল লেনের মেজ বৌ হিসাবেই চিঠি লিখেছে। গল্পের প্রারম্ভেই সে তাই তাঁর স্বামীকে 'শ্রীচরণকমলেষু' সম্বোধন করেছে; অর্থাৎ যে পরিচয়ে সে সেই গলির বাড়িতে পরিচিত ছিল, সেই পরিচয়েই নিজেকে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু গল্প যত এগিয়েছে, মৃণাল যত তার অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেছে পত্রে, ততই সে তার মেজ বউয়ের নির্মোক থেকে বেরিয়ে ব্যক্তি হিসাবে, মৃণাল হিসাবে নিজেকে পরিচিত করেছে। গল্পের অন্তিমে সে নিজের পরিচয়ে একমাত্র স্থিত থেকেছে এবং স্বামীকে লিখেছে 'ইতি তোমার চরণ তলাশ্রয়চ্ছিন্ন মৃণাল।' স্বামীর চরণ তলের আশ্রয় ছিন্ন করা এবং মনুষ্যত্ববোধের অধিকারী ব্যক্তিসত্তায় পরিচিত হতে চাওয়া মৃণালের এই জেহাদ রবীন্দ্র-সাহিত্যে, এমনকি বাংলা কথাসাহিত্যে সেদিনের নিরিখে অভিনব। কিন্তু এই অভিনব রূপটি কি শিল্পের স্বাভাবিকতায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থাপন করতে পেরেছেন? না কি মৃণালের ঘোষণা বাস্তববোধহীন কোনো নারীর প্রলাপ মাত্র বা 'নাটুকেপণা' মাত্র? অথবা তা কি লেখকের ব্যক্তিগত কোনো ক্ষোভের প্রকাশ মাত্র? অর্থাৎ মৃণালের স্বর কতটা স্বাভাবিক? মৃণালের পরিণতির মধ্যেই বা স্বাভাবিকতা কতখানি? মৃণালের কাজকর্ম, সিদ্ধান্ত কিংবা ব্যক্তিত্বময় উচ্চারণ সেদিনের প্রেক্ষিতে কতটা বাস্তবসম্মত?

'স্ত্রীর পত্র'-এর মৃণাল আর পাঁচজন নারীর চেয়ে নানা দিক দিয়েই স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করেছেন এই গল্পে আরও দুই নারী চরিত্র বড় বৌ আর বিন্দুর চরিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়েও। মৃণাল যদি বড় বৌয়ের মতো বাংলার রক্ষণশীল পরিবার-উত্থিত সংস্কারনিমগ্ন চরিত্র মাত্র হত, তাহলে সমস্ত কিছুই ধর্মের দোহাই দিয়ে মেনে নিতে পারত। আবার যদি সে বিন্দুর মতো হত-দরিদ্র পরিবারের অনাথ সন্তান মাত্র হত এবং অনাদরে প্রতিপালিত হতে হতে নিজের অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করে দিতে প্রয়াসী হত বা সদা সংকুচিত হত, তবে সেও ভাগ্যের দোহাই দিয়ে সব কিছু সহ্য করতে পারত। সে স্বতন্ত্র বলেই, সে নিঃসঙ্গ। পনেরো বছরের বিবাহিত জীবনে স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক কেবল আরোপিত সমাজ সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ থেকেছে, অন্তরের সম্পর্ক হয়ে ওঠেনি।

মৃণাল অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। সেকালের প্রথাবদ্ধ বাঙালি পরিবারে বুদ্ধি বড় বালাই। সে পুরুষের কথা শুনে চলবে, পুরুষের বুদ্ধির দ্বারা সে প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রিত হবে—এই যেখানে প্রচলিত পরম্পরা, সেখানে নারীর বুদ্ধি পুরুষের কাছে বিড়ম্বনা স্বরূপ। মৃণালও সে কথা টের পেয়েছে। অবশ্য সে একথাও বুঝতে পেরেছে যে, বুদ্ধির জন্যই শ্বশুরবাড়ির সকলে তাকে ভয় পায়। সে আর পাঁচজন মেয়ের মতো সব কিছু মেনে নিতে পারে না। সুতরাং বুদ্ধিমতী মৃণাল জ্ঞাত যে, তার বুদ্ধিই তাকে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন করবে প্রতিনিয়ত। সে তাই বলে—"যাকে বাধা মেনে চলতে হবে, সে যদি বুদ্ধিকে মেনে চলতে চায় তবে ঠোকর খেয়ে খেয়ে তার কপাল ভাঙবেই।"

মৃণালের শিল্পী-সত্তা তার স্বাতন্ত্র্যের দ্বিতীয় পরিচয়বহ। সে কবিতা লেখে। কবিতা লেখার মধ্য দিয়েই মৃণাল বদ্ধতার জগৎ থেকে বেরিয়ে আসে, অন্দরমহলের পাঁচিলের মধ্যে বেষ্টিত থেকেও সে পায় মুক্তির স্বাদ। মৃণাল তাই চিঠিতে লিখেছেঃ "আমার মধ্যে যা কিছু তোমাদের মেজো বউকে ছাড়িয়ে রয়েছে, সে তোমরা পছন্দ করনি, চিনতেও পারনি, আমি যে কবি, সে এ পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়েনি।"

শুধু মৃণালের কবিত্ব নয়, মাখন বড়াল লেনের পরিবারের কর্তাদের চোখে ধরা পড়েনি অনেক কিছুই। কিন্তু এসব কিছুই ধরা পড়েছে মৃণালের অন্তর্দৃষ্টিতে।

পল্লীগ্রামের উদার-মুক্ত পরিবেশে লালিত হওয়া মৃণাল মাখন বড়াল লেনের বদ্ধ পরিবেশে স্থিত মানুষগুলিকে আত্মার আত্মীয় হিসাবে পায়নি আর তাই মানবেতর প্রাণীগুলিকেই সে মনে করেছে আপন। ক্ষুধার্ত গরুগুলির জন্য সে সহানুভূতি প্রকাশ করেছে, তাদের খাইয়ে যত্ন করে সে পেয়েছে আনন্দ। অবহেলিত আর্ত-প্রাণের প্রতি মমতা এ বাড়ির মধ্যে কেবল তারই ছিল বলে তালুকের প্রজা যখন তাদের জমিদারকে ভক্ষণ করার জন্য ভেড়া দেয়, তখন সেই ভীত-সন্ত্রস্ত প্রাণীটিকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে প্রয়াসী হয় সে।

শুধু মানবেতর প্রাণী নয়, সংসারী মানুষেরা যখন তথাকথিত বড় কাজে ব্যস্ত, তখন প্রকৃতির আপাত-তুচ্ছ দৃশ্যগুলির দিকে দৃষ্টি পড়ে না তাদের। কিন্তু যিনি শিল্পী, কবি-প্রাণের অধিকারী সেই 'পাগল'-এর চোখে পড়ে সংসারের অকাজের, অপ্রয়োজনের তথা 'বাজে' দৃশ্যগুলি। তাই আবর্জনার স্তূপে পড়েও বেঁচে থাকা গাব গাছের ফুল ফোটা দেখে মৃণাল উপলব্ধি করে বসন্ত ঋতুর আগমনবার্তাকে।

সুতরাং পীড়িত প্রাণীর প্রতি যার মমতা, অবহেলিত দৃশ্যের প্রতিটি লহমা সম্পর্কে যার দৃষ্টি সজাগ, সে যে যন্ত্রণাতাড়িত একটি মানুষের প্রতি সহৃদয়তা প্রকাশ করবে তাতে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। যে বিন্দু অনাথ বা পিতৃমাতৃহীন, খুড়তুতো ভাইয়েরা তাকে আশ্রয়টুকু দেয় না, তার জন্য মাখন বড়াল লেনের 'তোমরা'দের সঙ্গে লড়াই করে সে। বিন্দুর যখন গায়ে ঘামাছির মতো বের হয় এবং সকলে বলে বসন্ত হয়েছে, তখন সে তাকে সবার মতো ঘৃণায় দূরে সরিয়ে দেয় না, তাকে নিজের ঘরটুকুতে জায়গা দেয় অর্থাৎ অন্তরে আশ্রয় দেয়। তাই দেখি, সকলে মিলে জঞ্জাল সাফ করার মতো তাকে পাগল স্বামীর সঙ্গে বিয়ে দিলে, মৃণাল নিজের শ্বশুরবাড়ি আর বিন্দুর শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সঙ্গে সংঘাতে প্রবৃত্ত হয়েও তাকে রক্ষা করতে উদগ্রীব হয়। শেষ পর্যন্ত যখন সে চাইলেও বিন্দুকে আটকে রাখতে পারেনি, বিন্দুও মৃণালকে বিড়ম্বনায় ফেলতে না চেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে, তখন অপরিসীম দুঃখ ও যন্ত্রণায় সে স্থির হয়ে বসে থাকেনি, বিন্দুকে বাঁচাতে চেয়ে গভীর বুদ্ধির প্রয়োগে নতুন কর্মপন্থা বের করতে চেয়েছে। সে উপলব্ধি করেছে তার অস্তিত্বের স্বরূপকে; মাখন বড়াল লেনের ২৭ নং গলির বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্কগত অবস্থানটি সে বুঝে নিতে পেরেছে আর তাই সে ঐ বাড়ি ত্যাগ করতেই শুধু চায়নি, জীবনযুদ্ধে পরাজিত নারী বিন্দুকে সঙ্গে নিয়েও যেতে চেয়েছে। যদিও বিন্দু যাবতীয় সমস্যা দূরে ফেলে দিয়ে আত্মবিনাশের পথটিকেই বেছে নেয়। অন্যদিকে এই আত্মবিনাশ থেকেই মৃণাল পেয়েছে তার আত্মপরিচয়, সে করেছে আত্ম-আবিষ্কার। বাঙালি পরিবারে মেয়েরা চলে আবেগ দিয়ে, তারা পদে পদে খাটো করে নিজেকে। কিন্তু মৃণাল যুক্তিবোধের দ্বারা চালিত হয়েছে, সে নিজেকে ছোট করতে পারেনি, সে সংসারের তাবত মেয়েদের জন্য বেদনা অনুভব করেছে। সচরাচর মেয়েরা যে সমস্ত অভাবের জন্য নিজেকে রিক্ত অনুভব করে তার কোনো অভাব মৃণাল উপলব্ধি করেনি। সে শাড়ি কিংবা গয়নার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেনি, কিন্তু প্রথাবদ্ধ সমাজব্যবস্থায় নারীর মর্যাদা লঙ্ঘিত হওয়াকে সে অনুভব করেছে আর তাই সে পেয়েছে যন্ত্রণা। বিন্দুর মতো, এমনকি বড় জার মতো মেয়েদের জন্য সে পেয়েছে বেদনা, প্রথার দাসত্বকারী পুরুষদের জন্য সে পেয়েছে লজ্জা। মৃণালের এই স্বাতন্ত্র্য, মৃণালের এই ভাবনা নতুন যুগের নারীর ভাবনা।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ গল্প রচনা করেছেন দ্বান্দ্বিক কাঠামো বিন্যাসের দ্বারা। তাই মৃণালকে তিনি যখন নবযুগের প্রতিনিধি হিসাবে গড়েছেন; তখন তারই পাশাপাশি বিন্দু বিশেষত বড় জাকে গড়েছেন, যে নারী প্রথাগত ভাবনায় আবদ্ধ, সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। মূলত মৃণাল চরিত্র আলোকিত হয়েছে বিন্দু ও বড় জা— এই দুই বিপরীত চরিত্র দ্বারা। মৃণালের ছিল রূপ আর তাই পাড়াগাঁ থেকে কলকাতায় পাত্রপক্ষের লোক তাকে বধূ হিসাবে চয়ন করেছিল। বড় জার রূপও ছিল না, তার পরিবারের টাকাও ছিল না, ছিল বংশকৌলীন্য। মৃণালের বিয়ে হয়েছিল তার রূপের জোরে আর বড় জার বিয়ে হয়েছিল তার শ্বশুরের হাতে-পায়ে ধরে অর্থাৎ তার শ্বশুরের দয়ায়। বড় জা সেকালের অগণিত বাঙালি নারীর প্রতিনিধি। তাই তার স্বামীর চরিত্রদোষ থাকলেও সে তার পতিদেবতার দোষ না, দেয় ভাগ্যদেবতার দোষ। অসংখ্য নারীর মতো তার হৃদয় আর শাস্ত্র দ্বিধাবিভক্ত। তাই অনাথ ও নিরাশ্রয় বোন যখন তার দিদির বাড়িতে আশ্রয় খোঁজে তখন নির্দ্বিধায় আপন জোরে সে তাকে আশ্রয় দিতে পারে না, খোঁজে নানা ফন্দিফিকির। বোনের খাওয়া পরার মোটা রকমের ব্যবস্থা করে ও তাকে দাসীবৃত্তিতে নিযুক্ত করে। শুধু তাই নয়, সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করে যে, অল্প আয়াসে ও কম ব্যয়ে একজন দাসী পাওয়া গেছে। বড় জা তার স্বামীর ভাবনার বাইরে কিছু ভাবতে পারে না, সে মনে করে স্ত্রীলোকের অবলম্বন ও পরিত্রাণ— সবকিছুই হল তার স্বামী। তাই বোন বিন্দু পাগল স্বামীর জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত হলেও সে তাকে শ্বশুরবাড়িতে পাঠাতে চায়, কেননা তার স্বামী তথা পরিবারের পুরুষেরাও তাই চায়, তারা আপদ বিদায় করতে পারলেই বাঁচে। বড় জা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মৃণাল তাই বারংবার তাকে পতিব্রতা, যে শাস্ত্রকে মান্য করে কিংবা ধর্মকে ভয় করে এমন একজন নারী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন—

১) "এই অনাথা বোনটিকে মন খুলে প্রকাশ্যে স্নেহ দেখাবেন, সে সাহস তাঁর হল না। তিনি পতিব্রতা।"

Scanned with CamScanner

২) "কিছুকাল থেকে লুকিয়ে দিদির চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, সেদিনও পড়ল। কিন্তু শুধু হৃদয় তো নয়, শাস্ত্রও আছে।"

৩) "বোধ করি দিদির চোখে সেটা পড়ে থাকবে, কিন্তু সেটা তিনি দেখেও দেখেননি। দোহাই ধর্মের, সেজন্য তোমরা তাঁকে ক্ষমা কোরো।"

পতিব্রতা বড় জা ধর্ম আর শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে মাথা হেঁট করে সেকালের নারীদের মতো সমস্ত মেনে নিয়েছে। নিজের বিয়ের কারণে সে অপরাধী, তার অবস্থান সংকুচিত , সকল ব্যাপারে যথাসম্ভব গুটিয়ে নিয়ে অল্প জায়গা জুড়ে সে তাই অবস্থান করে।

বিবাহিত দিদির যদি শ্বশুরবাড়িতে এ হেন অবস্থা হয়, তাহলে তার আশ্রিতা বোনের অবস্থান কেমন হবে তা সহজেই অনুমেয়। রবীন্দ্রনাথ তাই তার নাম দিলেন বিন্দু। প্রকৃতপক্ষে বিন্দু উপেক্ষিত, সে থাকে নামমাত্র অস্তিত্বে, স্বল্প স্থান জুড়ে, গভীর দৃষ্টিপাতে কোনো রকমে দর্শনেন্দ্রিয়ে ধরা পড়ে মাত্র। বিন্দু আশ্রিত, সে অনাথা, পিতা-মাতার সংসারে সে ঠাঁই পায়নি, খুড়তুতো ভাইয়েরা তাকে এতটুকু স্থান দেয়নি, দূর সম্পর্কের দিদির কাছে সে জায়গা পেয়েছে মাত্র। তার গায়ে ফুটকি দেখা গেলে তা হয়ে যায় বসন্ত, আবার সে দাগ মিলিয়ে গেলে সকলে উদ্বিগ্ন হয়, বলে বসন্ত বসে গেছে—'কেননা সে বিন্দু'। স্বদেশি হাঙ্গামার সময় সে অনায়াসে হয়ে ওঠে পুলিশের পোষা মেয়েচর—'সে যে বিন্দু। রবীন্দ্রনাথ ধ্রুবপদের মতো 'কেন না সে বিন্দু', 'সে যে বিন্দু' প্রভৃতি বাক্যাংশ প্রয়োগের দ্বারা একথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে তার অবস্থান কেবল সংকুচিত নয়, কিংবা সে সর্বদা সন্ত্রস্ত মাত্র নয়, তার মতো মেয়েকে সংসার নানাভাবে ব্যবহার করে। সংসারের, সমাজের পদ্ধতি বা তন্ত্রের শতধাজীর্ণ ত্রুটি সত্ত্বেও এই হতদরিদ্র, সংকুচিত, ত্রস্ত নারীর দোষই বড় হয়ে ওঠে। তাই তার বিয়ে দেওয়া হয় উন্মাদের সঙ্গে, কারও কিছু বলার থাকে না, তার দিদিরও কিছু করার থাকে না, সেখানে অত্যাচারিত হয়ে ফিরে এলেও সে কোথাও আশ্রয় পায় না। শেষ পর্যন্ত কাপড়ে আগুন ধরিয়ে সে আত্মহত্যা করে।

লক্ষ করার বিষয়, যে সময়ে রবীন্দ্রনাথ এ লেখা লিখেছেন, তখন পাশ্চাত্য আধুনিক নারীচেতনা সেভাবে বিকশিত হয়নি। সিমন দ্য বোভায়ার 'দ্য সেকেন্ড সেক্স' বের হয়েছে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে। বোভায়ার মতো নারীবাদীরা পুরুষতন্ত্রে নারীকে 'আদার' বা 'অপর' বা 'চ্যুত' বলে মনে করেছিলেন। 'স্ত্রীর পত্র'-এ রবীন্দ্রনাথ যদিও দ্বান্দ্বিক কাঠামো বিন্যাসের মধ্য দিয়ে এবং বৈপরীত্যমূলক চরিত্র সৃজনের মধ্য দিয়ে এ গল্প লিখেছেন, তবুও তিনটি চরিত্রই একটি বিষয়ে সমজাতীয়, তা হল প্রত্যেকেই চ্যুত বা 'অপর'। প্রত্যেকেই নিঃসঙ্গ। মৃণালের নিঃসঙ্গতা সীমাহীন, সে মা হওয়ার যন্ত্রণা পেয়েছে, তার আনন্দ পায়নি। গর্ভে ধরেও জন্মের পরই তার সন্তানের ঘটেছে মৃত্যু। সংসারে থেকেও, একই ছাদের নিচে বাস করেও তার জীবনবোধের সঙ্গে তার স্বামীর জীবনবোধ মেলেনি। খাওয়ার অভাব তার হয়নি, শাড়ি-গয়না সে পেয়েছে, কিন্তু পায়নি মর্যাদা। পায়নি আনন্দ। তার ব্যক্তিত্ব, তার স্বাতন্ত্র্য তাকে করেছে আলাদা। সে তাই নিঃসঙ্গ। অন্যদিকে সেকালের বড় ঘরের পুরুষের মতো বড় জার স্বামীর অর্থাৎ বড় ভাসুরের ছিল চরিত্রদোষ। সুতরাং বড় জা যতই কেননা ধর্মভীরু হন, ধর্মকে অবলম্বন করে ভাগ্যের কথা বলে নিজের কষ্টকে চাপা দিতে চান, তার নিঃসঙ্গতা উপলব্ধি করা যায়। বধূ হওয়ার পর সারাজীবন সংসারের সবার মন জুগিয়ে চলা নারীরও যে বোধশক্তি যথেষ্ট ছিল, সে তো আমরা উনিশ শতকে রাসসুন্দরীর আত্মজীবনীতে দেখি। আবার বিন্দুর একাকিত্ব অপরিসীম। এই একাকিত্ব ও অসহায়ত্বের কারণেই সে আত্মহত্যা করে।

দুই

রবীন্দ্রনাথের মতো সংবেদনশীল হৃদয়ের অধিকারী শিল্পী তাঁর ছোটগল্পে বারংবার নিঃসঙ্গ নারী হৃদয়ের যন্ত্রণাকে দেখিয়েছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আধিপত্যযুক্ত সমাজ এই সত্য মেনে নিতে চায়নি। যদিও শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছে রবীন্দ্রনাথেরই। তাই দেখি, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "প্রথম আমি মেয়েদের পক্ষ নিয়ে 'স্ত্রীর পত্র' গল্প বলি। বিপিন পাল তার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু পারবেন কেন?" রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্প লেখার পরে বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছিলেন 'মৃণালের কথা' গল্প। 'স্ত্রীর পত্র'-এ যদি সেকালের সংবেদনশীল ও মানবিক হৃদয়ের একটি প্রতিবেদন ধরা পড়ে, তাহলে পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যযুক্ত-রক্ষণশীল মানসিকতার আর একটি প্রতিস্পর্ধী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় 'মৃণালের কথা' গল্পে। গল্পটি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে গল্পকারের বক্তব্যকে ক্রমান্বয়ে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

বিপিনচন্দ্রের 'মৃণালের কথা' গল্পের শুরু ভগিনীর পত্রের মাধ্যমে। ভগিনী তার মেজ দাদাকে পত্র লিখেছে। তার বক্তব্য : 'স্ত্রীর পত্র'-এ মৃণালের নামে যে পত্রটি লেখা হয়েছে তা তাদের মেজ বৌ অর্থাৎ মৃণালের লেখা নয়। শুঁড়ওয়ালা নাগরা জুতো চুড়িদার জামা পরিহিত আর কবিদের মতো বাবরি চুল রাখতে অভ্যস্ত ও রবি ঠাকুরের জানাশোনা পরিচিত তার ভাইয়ের লেখা। 'বাহাদুরি মার্কা' চিঠিটি তাই রবি ঠাকুরের মতো।

তার মতে চিঠিটিতে মেজ বৌয়ের হিস্টিরিয়ার প্রকাশ ঘটেছে। তাদের বড় উঠোনটা তার চোখে তাই ছোট ঠেকেছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মেঝেগুলো তার চোখে

পড়েনি। আসলে, মেজ বউ চোখ দিয়ে কিছু দেখে না, অন্য সব কবি ও ঋষিদের মতো খেয়াল দিয়ে দেখে। তাই কালীপুজোর আগের অন্ধকার রাতেও সুন্দর চাঁদ দেখতে পায় এবং তা নিয়ে কবিতা লেখে।

শুধু তাই নয়, সত্যি জিনিসে মেজ বৌয়ের মন ভরে না। বাল্যকাল থেকেই ছোটকে সে বড় করে দেখে আর বড়কে দেখে ছোট করে। পিতৃগৃহ টালা থেকে শ্বশুরগৃহ শ্যামপুকুর আধঘণ্টার পথ, কিন্তু সে সোজাসুজি সেখানে যায় না। সে পিতৃগৃহ যায় কখনো শিয়ালদা থেকে রেলে করে দমদম গিয়ে তারপর ছ্যাকড়া গাড়িতে অথবা শ্যামবাজারে গিয়ে নৌকায় উঠে বাগবাজারে এসে রান্না করে খেয়ে পরের দিন শ্যামবাজারে পোলের কাছে নৌকা থামিয়ে তারপর পালকি করে। সুতরাং, মৃণাল বেশি দিন নীল সমুদ্র আর মেঘপুঞ্জ নিয়ে থাকতে পারবে না। তার বিশ্বাস, অচিরেই সে তার দাদার কাছে ফিরে আসবে।

বোন তার দাদাকে চিন্তা করতে নিষেধ করে এবং দাদার কথা মতো নিজে পুরী না গিয়ে স্বামীর ভাই অর্থাৎ দেবর নরেনকে পাঠায়। সেখানে সে মেজ বৌয়ের গোয়েন্দাগিরি করে এবং তার সেখানকার আচরণ ও কাজকর্ম পর্যালোচনা করে চরিত্র সম্পর্কে বিবরণ পাঠায়। সে জানায় মেজ বৌ তারই মতো সকালে চা পান করে পুরীর সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করে। এরপর গৃহে ফিরে আসে। নয়টার সময় নুলিয়া এলে সাড়ে নয়টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত সমুদ্রে স্নান করে, নুলিয়ার হাত ধরে ঢেউ খায় ও সাঁতার কাটবার ভান করে। এগারোটায় সে মধ্যাহ্ন আহার করে এবং তিনটে পর্যন্ত ঘুমায়। চারটের চা ও জলখাবার খাওয়ার পর পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত আবার সমুদ্রের ধারে বেড়ায়। এরপর রাতে আহার সমাপ্ত হওয়ার পর নিদ্রা যায়।

কলকাতার YMCA বোর্ডিং-এর সতীর্থ শরৎ যখন তাকে বাড়িতে নিয়ে যায়, তখন মেজ বৌয়ের সঙ্গে তার আলাপ হয়। মেজ বৌয়ের অনুরোধে তার বাড়িতে থেকে গেলে সে দেখে মেজ বৌ দিনরাত কেবল লেখাপড়া করে এবং যেখানে যা 'মিষ্টি কথা' পায় তা 'টুকে' রাখে। তার মতে এতে করে নাকি কবিতা লেখার সুবিধা হয়। ঐ মিষ্টি কথাগুলি দিয়ে 'হায়', 'সখি', 'সখা', 'বঁধূ' ইত্যাদি 'মিষ্টি কথার বুক্‌নী' যোগ করলেই এবং সজ্জিত করলেই চমৎকার কবিতা তৈরি হয়।

সেদিন একত্রে নরেন্দ্র সরোবরে বেড়াতে গিয়ে দেবর নরেন জানতে পারে মেজ বৌ আম গাছ চেনে না, সে আম গাছকে গাব গাছ বলে মনে করে। মেজ বৌয়ের মতে আম গাছ মাত্রেই তার ডালে ডালে কোকিল থাকে, শীর্ষে শীর্ষে থাকে 'ভৃঙ্গ', আকাশে থাকে 'কুঞ্জ' আর গৃহে থাকে 'উহু'। কেবল লাল পাতা দেখে আম গাছ চেনা যায় না, কারণ লাল পাতা গাব গাছেও আছে। সুতরাং মেজ বৌয়ের ভুল জগৎকে সঠিক বলে মেনে নিতে হয়েছে শরৎকে এবং তাকে সপক্ষে বলতে হয়েছেঃ "বিধাতা যে কবির চোখেই তাঁর জগতকে দেখেন। তিনিও ত কবি।"

নরেন জানতে পারে যে, মেজ বৌয়ের মনের বাহ্য স্তরে কবিতার তরঙ্গ উঠলেও ভিতরে ভিতরে সে ঠিক আছে। কেননা, শরৎ হঠাৎ কলকাতায় যাওয়ার আগে এক সাহিত্যিক বন্ধুকে সেখানে রেখে যায় এবং সেই বন্ধু যখন মেজ বৌকে জিজ্ঞাসা করে শরৎবাবু আর নরেনবাবুর মধ্যে বড় কে, তখন মেজ বৌ উত্তর দেয়—নরেন বড় হলেও পিঠোপিঠি বলে শরৎ তাকে কোনদিন দাদা বলে ডাকেনি। অর্থাৎ মেজ বৌকে আপাতভাবে বোকা মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সে বোকা নয়। কবিতা লিখলেও তার বিষয়বুদ্ধি প্রখর। তবে বাইরে কবিতা ঢেউয়ে সে আন্দোলিত। প্রত্যহ বিকেলে সমুদ্রতীরে সে কবিতা পড়ে। কবিতার ঢেউ তাকে অজানা উদ্দেশ্যে নিয়ে চলেছে। অবশ্য বউদিদি তার দেবরের উপর ভরসা রাখতে পারে। কেননা আগুনের ভিতর যাওয়ার কৌশল তার জানা।

শরতের মতে, সাহিত্যিক বন্ধু মিস্টার মৈত্র ব্রাউনিং-এর 'In a Belcony' কবিতাকে নিজের মতো অনুবাদ করেছে এবং তা শুনিয়ে মেজ বৌকে উন্মাদ করে দিয়েছে। মেজ বৌ সর্বদা তা আউড়ে বেড়াচ্ছে, এমনকি তার কিছু চরণ নরেনকেও শুনিয়েছে ও প্রশংসা করে বলেছে রবি ঠাকুর ছাড়া নাকি আর কেউ সে কবিতা লিখতে পারে না।

কিন্তু সেই মিস্টার মৈত্র শরতের জ্বর হলে পীড়াপীড়ি করে মেজ বৌকে স্বর্গদ্বারের কাছে সমুদ্রতীরে বেড়াতে যাবে বলে নিয়ে যায় চক্রতীর্থে, যা তার বাড়ি থেকে দেড় ক্রোশ দূরবর্তী। বেশ কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হলে এবং ফিরে না এলে নরেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। নরেন তাদের উদ্দেশে বের হয়ে দেখে নিরালায় মেজ বৌকে মিস্টার মৈত্র অশালীন আচরণের দ্বারা অপমান করতে উদ্যত হচ্ছে। এ দৃশ্যের সম্মুখীন হলে নরেন তাকে উত্তম মধ্যম প্রহার করে। এই ঘটনার অভিঘাতে মেজ বৌ প্রবল জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সুস্থ হয়ে উঠলে সে নরেনের প্রতি প্রভূত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। অর্থাৎ এ ঘটনা থেকে জানা যায় যে, নরেন চূড়ান্ত বিপদ থেকে উদ্ধার করে মেজ বৌকে। মেজ বৌ সরল বিশ্বাসে প্রতারক মিস্টার মৈত্রের পাতা ফাঁদে পা দিতে বসেছিল।

মেজ বৌ তার শারীরিক অসুস্থতা সূত্রে ও ডাক্তার প্রসঙ্গে নরেনের প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাত হয়। মেজ বৌ নরেনকে জানায় যে, সে তার স্বামীকে ত্যাগ করে এসেছে। নরেন এ সংবাদে বিচলিত হয়নি। কেননা, তার মতে হিন্দুর স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করতে পারে না, শাস্ত্রে তা নেই। সব স্ত্রীই রাগ করে নানা কথা বলে, কিন্তু সে তো মারধর করেনি,

Scanned with CamScanner

কেবলমাত্র একখানি চিঠি লিখেছে। নরেনের কাছে একথা শুনে মেজ বৌয়ের জ্বর ছেড়ে গেল, অর্থাৎ মেজ বৌয়ের যেন গভীর চিন্তার অবসান ঘটল।

মেজ বৌ বিন্দুর কারণে স্বামীগৃহ ত্যাগ করেছিল। নরেন জানিয়েছে, বিন্দুর আসলে মৃত্যু হয়নি। বিন্দু পরম শান্তিতে সংসার করছে। বিন্দু একদা যে স্বামীগৃহ ত্যাগ করেছিল তা মেজ বৌয়ের কারণে। মেজ বৌ তার মনে এই ভাব জাগিয়েছে যে, বিন্দু নির্যাতিত ও নিপীড়িত। নরেনের মতে যে নিজেকে নিপীড়িত মনে করে তার পক্ষে দ্রোহ অনিবার্য। সুতরাং বিন্দুর চলে আসার জন্য দায়ি মেজবৌ।

'শ্রীচরণেষু দিদি' সম্বোধন করে মৃণালকে চিঠি লিখে বিন্দু জানিয়েছে যে, সে মরেনি, মরার কোনো ইচ্ছেও তার নেই। বিয়ের আগে সে ধরেই নিয়েছিল যে, সে যেহেতু কুৎসিত দেখতে, তাই তাকে যে বিয়ে করতে চায় নিশ্চয়ই তার কোনো গলদ আছে। তাই শুভদৃষ্টির সময়ে ও বাসর ঘরে ভূতের ভয়ে যেমন চোখ বন্ধ করে থাকে ছোট ছেলেরা, তেমন করেই সে কোনোক্রমে রাতটি কাটিয়ে চলে এসেছে। কিন্তু কোথাও আশ্রয় না পেয়ে সে যখন স্বামীর কাছে গেল, তখন সে তার স্বামীর প্রেমে মুগ্ধ হল। সুতরাং সে বড় সুখে আছে।

অর্থাৎ বিপিনচন্দ্র তাঁর 'মৃণালের কথা' গল্পে দেখাতে চেয়েছেন : প্রথমত, মৃণালের বেরিয়ে আসার কোনো হেতু নেই। দ্বিতীয়ত, সে কবিভাবে পূর্ণ এবং কবিরা যেহেতু অদ্ভুত আচরণ করে, সুতরাং তার ব্যবহারও উদ্ভট। তৃতীয়ত, মেজ বৌয়ের মতো মেয়েরা স্বামীকে মান্য না করে বিপদেই পড়ে, মৃণালও পড়েছে। চতুর্থত, বিন্দু আদৌ মরেনি, মরেছে অন্য গলির অন্য বাড়ির কোনো মেয়ে। মৃণাল বলেছে, প্রধানত, সে বিন্দুর কারণেই শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করেছে। সুতরাং তার এই বেরিয়ে আসার ভিত্তিটিও অন্তঃসারশূন্য হয়ে যায়। অর্থাৎ মৃণাল ভুল করে চলে এসেছে এবং অচিরেই সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে।

বিপিনচন্দ্রের এ জাতীয় প্রতি-যুক্তি কতটা গ্রহণযোগ্য সে বিচার করার আগে গল্পের বিন্যাসগত কিছু ত্রুটি ও অনৌচিত্য দোষের উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, শরৎ আর নরেন কলকাতায় YMCA-এর বোর্ডিংয়ে একত্রে থাকত। পুরীতে তাদের দেখা হলে কিছুতেই নরেনকে শরৎ ছাড়েনি, বাড়িতে নিয়ে গেছে এবং মেজ বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। অথচ আশ্চর্য লাগে যে, কেন শরৎ এর আগে বোর্ডিংয়ে দিদির প্রসঙ্গ নরেনের কাছে বলেনি, কিংবা দিদির বাড়ি নরেনকে নিয়ে যায়নি। নরেন কটক থেকে পুরীতে তার প্রিয় বৌদিদির কথা শুনে গোয়েন্দাগিরি করতে গেছে, অথচ এর আগে কলকাতায় থাকার সময় তার সেই প্রিয় বৌদিদির বাড়ি দেখেনি, কিংবা মেজ বৌয়ের সঙ্গে পরিচয় করেনি—এই কার্যকারণবোধের অভাব বড় বিস্ময় তৈরি করে। দ্বিতীয়ত, পুরীতে থাকার সময় মেজ বৌয়ের সঙ্গে প্রথম দিন আলাপ করার পরই সে তার বউদিদিকে লিখেছে—"তোমার মেজ বউ-এর ডায়রীও ঠিক এই।" মেজ বৌয়ের ডায়ারির সমরূপতা সম্পর্কে সে জ্ঞাত হল কী করে? আবার, সেই ডায়ারির বক্তব্য আর পরবর্তীকালের কার্যধারার পার্থক্যও লক্ষ করার মতো। বাড়িতে খাওয়া আর সমুদ্রে নুলিয়ার কাছে সাঁতার কাটা— মেজ বৌয়ের এই কাজের পরিচয় পরে তো সে আর দেয়নি। সে যখন মেজ বৌয়ের কাছে কয়েকদিন থাকল, তখন সে তার কবিতা পড়া আর শব্দ চয়ন করে লিখে রাখা এবং তা দিয়ে নিজের কবিতা তৈরি করার কথাই লিখেছে। তাহলে কোন্‌টি ঠিক? না কি, কটাক্ষ করতে গিয়ে চরিত্র এবং তার স্রষ্টা বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছেন!

তৃতীয়ত, মৃণালের ননদ কোথা থেকে এল? এ চরিত্র কল্পনা করার হেতু কী? বিশেষত, মৃণাল যখন তার উল্লেখ মাত্র করেনি। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র'-এ মৃণাল তার স্বামীকে বলেছেঃ তোমরা জান না যে আমি কবিতা লিখি, আজ পনেরো বছর ধরে সে পরিচয় গোপন আছে। অথচ তার ননদ বলে যে, সে কবিতা লেখে, সেই কবিতা সে পড়েছে। এমনকি সে এও মনে করেছে যে, বাড়িতে সেই কবিতা মৃণাল রেখে গেছে। এমন একজন দায়িত্বশীল ও সংবেদনশীল ননদ, এমনকি বাড়ির একমাত্র পাঠক পাওয়া সত্ত্বেও 'স্ত্রীর পত্র'-এ মৃণাল তার নাম উল্লেখ করেনি। অথচ, বিপিনচন্দ্র মৃণালের ননদ চরিত্র কল্পনা করলেন, সেই ননদ তার দাদাকে চিঠি দিয়ে মেজ বৌয়ের কোনো বিপদ ঘটবে না—এই অভয় দেয়—এ সমস্তও চিত্রিত করলেন। সবমিলিয়ে এক ধরনের কষ্টকল্পনা করলেন।

চতুর্থত, বিন্দু কেন শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে এসেছে এবং পুনরায় ফিরে গেছে এ কৈফিয়ৎ বড় বেশি জোড়াতালি দেওয়া। বিন্দু শুভদৃষ্টির সময় চোখ বন্ধ করে ছিল, সে না হয় মেনে নেওয়া যায়; কিন্তু স্বামীর আচরণের যে ব্যাখ্যা সে দিয়েছে, তা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য হয় না। বাসর ঘরে তার স্বামী কাচের বাসন ভেঙে চুরমার করে দেয়, কিংবা জুতো পায়ে লাথি মেরে ভাতের থালা ও হেঁসেল লণ্ডভণ্ড করে দেয়। আবার সাতাশ নং মাখন বড়াল লেনের বাড়ি কিংবা খুড়তুতো ভাইয়ের বাড়িতে আশ্রয় না পেয়ে বাধ্য হয়ে বিন্দু শ্বশুরবাড়ি যায় এবং সেখানে তার স্বামী যেভাবে প্রেমানুরাগ প্রকাশ করে —তা সম্পূর্ণভাবে বিপরীত। প্রকৃতপক্ষে, বিপিনচন্দ্রের 'মৃণালের কথা'য় প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্র-বিদূষণ। বিপিনচন্দ্রের বক্তব্যেও নারীর শৃঙ্খলাভঙ্গের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে। বিপিনচন্দ্র বারংবার রবীন্দ্রনাথকে কটাক্ষ করেছেন, এমনকি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবেও আক্রমণ করেছেন। তিনি মেজদাদাকে লেখা ভগিনীর পত্রে রবীন্দ্রনাথের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করতেও দ্বিধান্বিত হননি। আবার মৃণালের চিঠির ভাষা

Scanned with CamScanner

রবীন্দ্রনাথের ভাষার মতো একথা যেমন বলেছেন, তেমনি মৃণালের ভাই শরতের পোশাক পরিচ্ছদ তাঁর মতো—এ উল্লেখও করেছেন। শুধু তাই নয়, মৃণালের কবিতা সম্পর্কে এমনভাবে কটাক্ষ করেছেন যে, মনে হয় সাহিত্য বিষয়ে রচয়িতার উন্নাসিকতা স্পষ্ট। তাই দেখি, প্রায় প্লেটোর মতোই কবিদের সম্পর্কেই তিনি ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করেছেন।

কিন্তু প্রভূত বিদূষণ ও ব্যঙ্গ-কটাক্ষ সত্ত্বেও বিপিনচন্দ্র প্রকারান্তরে রবীন্দ্রনাথ 'স্ত্রীর পত্র'-এ যে সত্য প্রকাশে সচেষ্ট, তাকেই স্বীকার করেছেন। বিপিনচন্দ্র দেখিয়েছেন : বিন্দু নয়, বিন্দুর মতো একটি মেয়ে পাশের বাড়িতে আত্মহত্যা করেছে, বিন্দু তা দেখে স্তম্ভিত হয়েছে ও জ্ঞান হারিয়েছে। সুতরাং, রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র'-এর মৃণাল যে বলেছে, দেশসুদ্ধ মেয়েদের কাপড়ে কেন আগুন লাগে, পুরুষের কোঁচায় কেন লাগে না— একথা যুক্তিসিদ্ধ হয়ে যায়। আবার, স্নেহলতার আগুনে পুড়ে মরার বিষয়টি নিয়ে যতই কৌতুক-কটাক্ষ করুন না কেন বিপিনচন্দ্র, তার সুইসাইড নোট যারই লেখা তিনি বলতে চান না কেন, স্নেহলতা ও বিন্দুর শ্বশুরবাড়ির পাশের গলির বাড়ির মেয়ের মৃত্যু— উপর্যুপরি দুটি মেয়ের আত্মহত্যার কথা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন।

আবার নরেন মেজ বৌকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে এবং সে বিবরণের মধ্য দিয়ে বিপিনচন্দ্র মেজদাদা-বৌদি অর্থাৎ মৃণালের শ্বশুরবাড়ির সহৃদয়তাকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, কবিভাবেই হোক, কিংবা যে কোনো ছলনাতেই হোক পুরুষেরা মেয়েদের নানাভাবে লাঞ্ছিত করত। সুতরাং, বিপিনচন্দ্র যতই কেন না, রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র'-এর ব্যঙ্গাত্মক গল্প লিখে রবীন্দ্রনাথের বীক্ষাকে আক্রমণে সচেষ্ট হন, তাঁর লেখায় শৈল্পিক দুর্বলতা প্রকট, তেমনি বক্তব্যেও ব্যক্তিগত বিদ্বেষকে তিনি অতিক্রম করতে পারেননি, তাতে গভীরতার অভাব স্পষ্ট। উপরন্তু প্রকারান্তরে রবীন্দ্রনাথের অভীপ্সিত সত্য স্বীকার করেছেন বিপিনচন্দ্র—সমনস্ক পাঠক মাত্রেই তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

তিন

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মে, রবিবার বিদেশযাত্রা কালে তৎকালের বোম্বাই উপকূলে অবস্থানের সময় সেখানকার সমুদ্রসংলগ্ন এলাকাগুলিতে স্ত্রী-পুরুষের নিঃসঙ্কোচ মেলামেশায় অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলার বহির্জীবনে নারীদের অনুপস্থিতিজনিত অসম্পূর্ণ জীবনের কথা মনে করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। সে যাত্রার সঙ্গী মহেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মার সন্তান সোমেন্দ্রচন্দ্র তাঁর 'রবীন্দ্র-সঙ্গমে য়ুরোপ প্রবাসের স্মৃতিকথা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সে সময়ের কথোপকথন লিপিবদ্ধ করেছেনঃ

"গুরুদেব কথা প্রসঙ্গে বলিলেন "এ বিষয়ে বাঙ্গালী সমাজ অঙ্গহীন। স্ত্রী শক্তি বাংলায় এখনো সুপ্ত। ভারতের নবযুগে নারীশক্তির আবির্ভাব নিতান্ত প্রয়োজন। না হয় তো জাতীয় জীবন অর্দ্ধমৃত অবস্থায় থাকিয়া যাইবে। সে জন্য এ অঞ্চলে নারী লাঞ্ছনার অমানুষিক কাহিনী শোনা যায় না, তাহারা আশৈশব মুক্ত হাওয়ায় মানুষ হইয়া স্বীয় শক্তির দ্বারা সমাজে নিজ স্থান অধিকার করিয়া পুরুষের নিকট প্রাপ্য সম্মান আদায় করিয়া লইতেছে।"

'নারী লাঞ্ছনার অমানুষিক কাহিনী' বঙ্গসমাজে তিনি শুনে এসেছেন বারবারই। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মে তিনি এমন কথা বলেছেন আর ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি এমনই একটি নারী নিষ্পেষণের শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল বঙ্গসমাজেই, যার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পেও আছে। 'স্ত্রীর পত্র' গল্প লেখা হয়েছে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের জুন-জুলাই মাসে। এই গল্পে বিন্দু কাপড়ে আগুন লাগিয়ে মারা গেলে বাড়ির পুরুষ-কর্তারা উপহাস করেছিল, যা শুনে মৃণাল বলেছিল : "কিন্তু নাটকের তামাশাটা কেবল বাঙালি মেয়েদের শাড়ির উপর দিয়েই হয় কেন, আর বাঙালি বীরপুরুষদের কোঁচার উপর দিয়ে হয় না কেন, সেটাও তো ভেবে দেখা উচিত।" মৃণালের বক্তব্য যে সঠিক, সে প্রমাণ পাওয়া যায়, বিপিনচন্দ্র পালের 'মৃণালের কথা' অংশের 'ভগিনীর পত্র'-এ। আগেই বলা হয়েছে, বিপিনচন্দ্রের লেখায় রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র'-এর বিপরীত ডিসকোর্স নির্মাণ করা হয়েছে। তবুও সেই ডিসকোর্সের মধ্যে লেখকের বক্তব্যের অন্তরালেও রয়ে গেছে কিছু বাস্তব সত্য। তাই প্রতিস্পর্ধী বীক্ষার অধিকারী হয়েও অগোচরে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকেই যেন সমর্থন করে ফেলেছেন। তাই দেখি, সেখানে বারবার স্নেহলতার উল্লেখ করা হয়েছে। তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে, বলা হয়েছে 'স্নেহলতা ছুরিটার কথা'। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি স্নেহলতা কাপড়ে আগুন দিয়ে মারা যায় এবং তার মৃত্যু তৎকালীন বাঙালি সমাজের শিক্ষিত মহলে যে আলোড়ন তুলেছিল তা অন্য কোনো নারীর আত্মহত্যা বা লাঞ্ছনার ক্ষেত্রে ঘটেনি। একজন মহৎ লেখকের অতুলনীয় প্রতিভা উপলব্ধি করা যায়, তাঁর সৃষ্টিতে প্রতিফলিত লেখকের জীবনভাবনা আর পরবর্তী সমাজ জীবনে ঘটমান সত্যকে মিলিয়ে পড়লে। যে রবীন্দ্রনাথ একদা 'দেনাপাওনা' (১৮৯৩) গল্পে দেখিয়েছিলেন নিরুপমার বেদনার্ত চিত্রের কথা, তাই তো ঘটে যায় একুশ বছর পরে (১৯১৪) স্নেহলতার ক্ষেত্রে। 'দেনাপাওনা'য় নিরুপমা নিজেকে 'টাকার থলি' বলে মনে করতে পারেনি, তার বাবার অপমান সে সহ্য করতে পারেনি, ফলত সে তার পিতাকে দিয়ে শ্বশুরকে টাকা দেওয়ায়নি। পরিণামে সে আত্মক্ষয় করেছে, শীতের দিনে উত্তরের জানালা খুলে দিয়ে অসুস্থ হয়েছে এবং মৃত্যুবরণ করেছে। 'দেনাপাওনা' গল্প

Scanned with CamScanner

লেখার সাত বছর পরে (১৯০০) স্নেহলতার জন্ম। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পালং থানার কাগদি বা কাগরি গ্রামে হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা স্নেহলতা জন্মগ্রহণ করেন। শ্যামবাজারের ৪৩/১ রাজবল্লভ স্ট্রিটে হরেন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রী ও কন্যাদের নিয়ে বাস করছিলেন স্ত্রীর মৃত্যুর তিন বছর আগে থেকেই। স্নেহলতার চৌদ্দ বছর বয়স হলে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা হরেন্দ্রনাথ জনৈক মুখোপাধ্যায় বংশের একটি বি.এ. পাশ পাত্রের সন্ধান পান। পাত্রপক্ষ হাতেহাতে নয়শ টাকা এবং বারোশ টাকার অলঙ্কার বরপণ হিসাবে দাবি করেন। কিন্তু প্রায় দু'হাজার টাকার পণ দেওয়ার সামর্থ্য কন্যা-পিতা হরেন্দ্রনাথের ছিল না, আবার এই রকম বি.এ.বি.এল. পাত্র অর্থাৎ কলেজি পাশ কেতাবি ডিগ্রিধারি তথাকথিত শিক্ষিত পাত্র হাতছাড়া করতে রাজি ছিলেন না স্নেহলতার পিতা। ফলত বাড়িঘর বন্ধক রেখে তিনি যাবতীয় টাকা সংগ্রহে উদ্যোগী হন এবং নিকটবর্তী ১৪ ফাল্গুন বিবাহের দিন স্থির করেন।

কিন্তু মর্যাদাবোধ সম্পন্ন নারী স্নেহলতা পাত্রপক্ষের এই অন্যায্য দাবিতে এবং পিতার অক্ষমতায় অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তাঁর বিবাহের কারণে তাঁর পিতা শেষ সম্বল বাড়িটুকু হারাবেন একথা কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। 'দেনাপাওনা' গল্পে পিতা রামসুন্দর বরপণ বাকি রাখলে বিবাহের পর নিরুপমাকেও একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। আত্মমর্যাদা বিসর্জন না দিয়ে সে পিতাকে তখন বলেছিল যে, কিছুতেই তার শ্বশুরকে টাকা দেওয়া যাবে না, কারণ সে কেবল 'টাকার থলি' নয়।

নিরুপমার কাহিনি স্নেহলতা শুনেছিল কিনা সে তথ্য আমাদের জানা নেই। তবে স্নেহলতা প্রথাগত শিক্ষায় ডিগ্রিধারী না হলেও নিজ গৃহে সুশিক্ষা পেয়েছিলেন, হয়ে উঠেছিলেন স্বশিক্ষিত। তাই পিতাকে আসন্ন বিপদ থেকে পরিত্রাণ করতে বেছে নিয়েছিলেন অপরাহ্নের নির্জন ছাদ, কেরোসিন তেল, দেশলাই বাক্স আর পরিধানের বস্ত্র। কেরোসিন-সিক্ত বস্ত্রে অগ্নিসংযোগের মধ্য দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন তিনি। বাঙালি সমাজে প্রথাবদ্ধ জীবনে পীড়নের কারণে আত্মহত্যার ঘটনা নতুন কিছু নয়। কিন্তু সেই ঘটনায় সেদিনের শিক্ষিত সমাজ কেবল উদ্বিগ্ন মাত্র হয়নি, তাঁদের আলোড়ন প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্নভাবে। একদিকে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধে যেমন প্রচলিত বরপণ প্রথার অন্তরালে নিহিত নিষ্ঠুরতাকে দেখানো হয়েছিল, অন্যদিকে প্রগতিশীল লেখকেরা তথাকথিত শিক্ষিত পাত্রপক্ষের মনোভঙ্গির প্রতি চরম বিদ্রূপ এবং পথপ্রথার যূপকাষ্ঠে বলি হওয়া নিষ্পাপ নারীর প্রতি তীব্র সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত অনেকগুলি পত্রিকায় স্নেহলতা সংক্রান্ত ঘটনাটির প্রতিক্রিয়া ধরা পড়েছে। তার কয়েকটি উপস্থাপন করা হল—

সঞ্জীবনী মহিলাতে আক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছিল এইভাবে:

> "সমাজ যদি জীবিত থাকিত, তবে আজ প্রলয়কারী গভীর গর্জ্জন শুনিতে পাইতাম। আজ এক পক্ষকাল হইল, বালিকা বলি হইয়াছে, ইহার মধ্যে জনসমুদ্র সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠত—বঙ্গদেশের ৪ কোটি নরনারী ক্ষিপ্ত হইয়া বলিত "আজ হইতে বরপণ উঠিয়া গেল।"

১৩২০ বঙ্গাব্দে ১০ম সংখ্যা ৯ম ভাগের 'ভারত মহিলা' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> "স্নেহলতার শোকাশ্রু মুছিতে মুছিতে আমরা আমাদিগের তরুণী ভগিনীদিগকে সানুনয়ে অনুরোধ করিতেছি, আমাদের একটী ভগিনীর এই প্রকার জীবনদানেও যদি কাপুরুষদিগের চৈতন্য না হয় তবে আর কেহ আগুনে পুড়িয়া মরিও না, এই পশুদের পশুত্ব তাহাতে ঘুচিবে না, বিধাতা প্রদত্ত এই অমূল্য জীবন নরপশুদিগের পাপক্ষয়ের জন্য তোমরা কেন পূনঃ পুনঃ বিসর্জ্জন করিবে?"

ফাল্গুন ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'প্রবাসী'র বিবিধ প্রসঙ্গে তথাকথিত শিক্ষিতদের উদ্দেশে বলা হয়:

> "যিনি কেবল প্রেমের পাত্রীকেই চান, টাকা মান সম্পদাদি আর কিছুর প্রতি দৃকপাত করেন না, তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রেমিক। নতুবা কেহ যদি প্রেমের কবিতা লিখিয়া বঙ্গের সমুদয় সম্পাদককে হয়রান করিয়া ফেলেন, আর বিবাহের সময় দরিদ্র শ্বশুরের নিকট হইতেও বাপ মাকে পণ লইতে দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পুরুষাধম, কাপুরুষ, অপ্রেমিক বলা ভিন্ন উপায় কী?"

'প্রবাসী' পত্রিকায় পরের সংখ্যায় অর্থাৎ চৈত্র ১৩২০ বঙ্গাব্দে স্নেহলতার মৃত্যু-সংক্রান্ত ঘটনায় যখন আধিপত্যকামী সমাজের কর্ণধারেরা ব্যথিত না হয়ে বাল্যবিবাহের পক্ষে যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে হলে তারা মা-বাবার দুঃখ যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারবে না, সুতরাং এ ধরনের ঘটনা ঘটবে না, তখন তার প্রতিবাদ করে লেখা হয়েছিল:

> "যেন দুর্ঘটনা ঘটাটাই একমাত্র দুঃখের বিষয়; যে জঘন্য সামাজিক রীতির জন্য লোকে সর্বস্বান্ত হইতেছে, বৈবাহিকে বৈবাহিকে মনান্তর ঘটিতেছে, দায়ে পড়িয়া পণ দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা রক্ষা করিবার জন্য বা এড়াইবার জন্য লোকে প্রতারণা করিতেছে, বালিকারা আত্মঘাতী হইতেছে, সেই রীতিটাই যেন ঘোর পরিতাপের বিষয় নয়। তাছাড়া বাপমায়ের টাকার যোগাড় হয় না বলিয়াই তো অনেকস্থলে অবিবাহিতা কন্যার বয়স বাড়িয়া চলিতে থাকে। ফোঁড়া হইলে যদি কোন ডাক্তার তাহা ঢাকিয়া রাখিতে বলে, কিন্তু রোগ বিনাশ করিবার কোন চেষ্টা করে না, তাহার ব্যবহার যে রূপ, এই যুক্তির স্রষ্টাদের আচরণও তদ্রূপ।"

Scanned with CamScanner

'প্রজাপতি' কিংবা 'কায়স্থ' পত্রিকার তরফ থেকে এ ধরনের প্রতিবেদন সে সময় বারবার লেখা হয়েছিল। তাছাড়া সচেতন সামাজিকদের পক্ষ থেকে অনেকেই লিখেছিলেন প্রবন্ধ এবং কবিতা। রসিকলাল রায়ের 'সমাজ সমস্যা', যদুনাথ চক্রবর্তীর 'বিবাহ পণে বালিকার আত্মবলি', ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর 'বাল্যবিবাহ ও বরপণ', অশ্বিনীশঙ্কর চৌধুরীর 'হিন্দু সমাজের পণপ্রথা', অখিলচন্দ্র পালিতের 'বরপণ সম্বন্ধে চিন্তা', কেশবচন্দ্র নাগের 'পণপ্রথার পরিণাম' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য। ইংরেজিতে দ্য মর্ডান রিভিউ-এর মতো বিভিন্ন পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে। বিভিন্ন স্থানে পণপ্রথা বিরোধী সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল, ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের 'প্রজাপতি' পত্রিকা থেকে যশোরে অনুষ্ঠিত এ ধরনের সভার প্রতিবেদন বের হয়েছিল। এছাড়াও গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার প্রতি বিবাহযোগ্য বালিকার উক্তি', প্রমথ চৌধুরীর 'স্নেহলতা', করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্নেহলতা', সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'মৃত্যু স্বয়ম্বর', প্যারীশঙ্কর দাশগুপ্তের 'স্নেহলতা', নীহারের 'স্নেহলতার বিদায়' প্রভৃতি কবিতার মাধ্যমে স্নেহলতার মৃত্যুর প্রতিবাদদীপ্তিকে স্মরণীয় করে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে গোবিন্দচন্দ্র দাসের কয়েকটি চরণ সেকালে রীতিমত জনপ্রিয় হয়েছিল। কবিতার প্রথম স্তবকে পরিস্ফুট হয়েছিল সোচ্চার প্রতিবাদ এবং জ্বালাময় উচ্চারণ, যা জনসমাজকে আলোড়িত করেছিল:

''বাবা! থাকুক আমার বিয়ে,
চাইনে আমি এম,এ বি,এ কিনতে হয় যা টাকা দিয়ে,
ছাগল গরুব মত যাদের, ছেলের হাটে গিয়ে,
সোনার চেইন-সোনার ঘড়ি, গর্ব্ব যাদের গলায় পরি,
অমন পশু কিনো নাক কাণা কড়ি দিয়ে!''

উল্লেখ্য, এই সমস্ত লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২০ বঙ্গাব্দে। সুতরাং দেশ ও কাল সম্পর্কে সদা জাগর, হৃদয়বান ব্যক্তিত্ব, উদার-নৈর্ব্যক্তিক জীবন মূল্যবোধের অধিকারী এবং সংবেদনশীল মনের অধিকারী রবীন্দ্রনাথকে এ ঘটনার অভিঘাত ও মর্মান্তিকতা এবং তজ্জনিত মানবিক প্রতিবাদের উত্তাপ স্পর্শ করবে তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। কিন্তু আশ্চর্য লাগে, যে-রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন : ''কবি তব মনোভূমি রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো''—তা কেমনভাবে যথার্থ সত্য হয়ে ওঠে। তাই দেখি, তিনি স্নেহলতার মৃত্যুর কত আগে 'দেনাপাওনা' গল্প লিখেছিলেন!

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাস্তবের তথ্যকে কীভাবে সাহিত্যের সত্যে পরিণত করতে হয় এ সম্পর্কে ছিলেন প্রখরভাবে সচেতন। তাই তিনি এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় লিখলেন না দ্বিতীয় 'দেনাপাওনা', অর্থাৎ সে গল্পের আর পুনরাবৃত্তি করলেন না। বাস্তবের জগৎ থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে শিল্পী-মনের জারক রস মিশিয়ে সংগুপ্ত শক্তি (occult power)-র সাহায্যে তিনি যে গল্প রচনা করলেন তা 'দেনাপাওনা'-র জগৎ থেকে কত দূরবর্তী! 'দেনাপাওনা'র অভিমানী নারী নিরুপমা নয়, পেলাম 'স্ত্রীর পত্র'-এর প্রতিবাদদৃপ্ত নারী মৃণালকে। এক্ষেত্রে স্নেহলতার মৃত্যুর অনুষঙ্গটিকে কেবলমাত্র বিন্দুর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দ্যোতিত করলেন। কিন্তু সেখানে মূলত পণপ্রথার ব্যাপারটিকে আলোকিত করলেন না। বরং দেখালেন, আধিপত্যের ধরন কত রকমের হতে পারে! আধিপত্যাধীনের অবমাননার মূল কোথায়! 'দেনাপাওনা'-র নিরুপমারা কোন্ শক্তিতে কী অর্জন করতে চায়!

এদিক দিয়ে 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের আবেদন বহুমাত্রিক। আসলে, রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। কেবলমাত্র স্নেহলতার ঘটনাটিই তাঁকে আলোড়িত করেনি, বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন সময়ে অবনমিতের ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ তাঁকে বারবার দেখতে হয়েছিল। নারীর সঙ্কুচিত অবস্থান, পদে পদে তার মর্যাদার অবমাননা, দাম্পত্য জীবনে নিহিত বৈষম্য, সবমিলিয়ে তার যন্ত্রণাদগ্ধ অবস্থান বিষয়টি তাঁর পরিচিত জীবনে দেখেছিলেন। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে সুদীর্ঘকাল ধরে পরিচিত এমন পরিবারগুলিতে নারীর জীবনের বেধনাবিধুরতাকে কখনো তিনি অনুভব করেছিলেন, কখনো নিজের বাড়িতেই পিতা হিসাবে কন্যার ম্লানচিত্তকে উপলব্ধি করেছিলেন। কবির 'মনোভূমি' বাস্তবের তথ্যভূমি অপেক্ষা অধিকতর সত্য। তাই এ ধরনের ঘটনা থেকে 'স্ত্রীর পত্র'-এর মতো যে গল্প তিনি লিখলেন, তা অনেক বেশি জোরালো, অনেক বেশি আবেদনঋদ্ধ। কেননা, এ গল্প লেখার পরেও গল্পের জগতের ঘটনার পুনরাবৃত্তিই বাস্তবে ঘটেছে বারবার।

চার

উনিশ শতকের শিক্ষিত সমাজ ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে বহুমাত্রিকভাবে আলোড়িত হয়েছিল। বাইরের প্রবল হাওয়া এ যুগের ইংরেজি শিক্ষিত নতুন যুবকদের আলোড়িত করেছিল। ফলত, সেই সব যুবকেরা যখন পিতা হলেন, কিংবা স্বামী হলেন তখন বহুবিধভাবে বদ্ধমূল প্রথাকে উপেক্ষা করে অন্দরের নারীদের নিয়ে আসতে চাইলেন সদরে, কিংবা প্রগতিশীল মানুষেরাও নানাভাবে মেয়েদের শিক্ষিত করতে সচেষ্ট হলেন, যে সমস্ত সংস্কার নারীদের পীড়িত করে সেগুলির বিরুদ্ধাচরণ করলেন। এই সময়ের নারীদের স্মৃতিকথা, আত্মকথা, আত্মজীবনী, ব্যক্তিগত কথা তথা জবানবন্দিগুলি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় তারা সেই সময়কে কীভাবে গ্রহণ

Scanned with CamScanner

করেছিলেন। দেখা যায়, উনিশ শতকেই দুটি ভিন্ন ডিসকোর্স নির্মিত হয়েছিল। এই ডিসকোর্সের একটি দিকে যেমন নতুন সময়কে বরণ করে নেওয়ার তাগিদ দেখা গিয়েছিল, তেমনি এর অন্য দিকটিতে প্রথা কিংবা সংস্কারকে সম্পূর্ণত বিসর্জন না দিয়ে প্রথাবদ্ধতাকে আঁকড়ে থাকার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। কলেজ স্ট্রিটের গুপ্ত প্রেসের মালিক দুর্গাচরণ গুপ্তের স্ত্রী কৈলাসবাসিনী যখন তীব্রভাবে প্রথামুক্তির কথা শুনিয়েছিলেন তাঁর 'হিন্দু মহিলাগণের হীনবস্থা' কিংবা 'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভাস'-এ, তখন নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী তাঁর 'নারীধর্ম' গ্রন্থে প্রথাধর্ম মান্য করার পক্ষেই অভিমত পোষণ করেছিলেন। সুতরাং, রবীন্দ্রনাথ যখন 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মধ্যে মৃণাল এবং বড় জার চরিত্রগত স্বরূপ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে প্রতিস্পর্ধী বক্তব্যকে রাখেন, তখন তা উনিশ শতকের নারী প্রগতি বিষয়ে নারীদের ডিসকোর্সের প্রতীকীরূপ পেয়ে যায়। তাই দেখি, মৃণাল যেখানে পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যকে দেখাতে পারে, সেখানে তার বড় জা ধর্মের কারণে, পাতিব্রত্যের দোহাই দিয়ে কিংবা প্রবল সংস্কারের বশে সমস্ত কিছু মেনে নেয়।

দাম্পত্য জীবনের অংশীদার নারী পুরুষের প্রবল ব্যবধানকে কিংবা নারীর মর্যাদা লঙ্ঘনকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিচিত অনেকগুলি দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে অনুধাবন করেছিলেন। প্রথমেই বলা যায়, কৃষ্ণভাবিনী দাসের কন্যা তিলোত্তমার প্রসঙ্গ। নদীয়া জেলার অখ্যাত গ্রাম কাজলায় ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে জন্ম কৃষ্ণভাবিনীর। তাঁর বিয়ে হয় দেবেন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে। দেবেন্দ্রনাথের পিতা শ্রীনাথ দাস ছিলেন বিদ্যাসাগরের বন্ধু এবং হাইকোর্টের উকিল। দেবেন্দ্রনাথের অন্য ভাই উপেন্দ্রনাথ এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথও ছিলেন বিশেষভাবে খ্যাত। উপেন্দ্রনাথ ছিলেন নাট্যরচয়িতা, নাট্য-পরিচালক ও প্রযোজক। তাঁর 'শরৎ সরোজিনী' নাটকের জন্যই নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল চালু করেন তৎকালীন ইংরেজ সরকার। অন্যদিকে, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ছিলেন সমাজ সংস্কারক এবং পিতার মতোই হাইকোর্টের উকিল। পিতা শ্রীনাথ বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ একজন সমাজ সংস্কারক হিসাবে বিধবা বিবাহের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু নিজের পুত্র উপেন্দ্রনাথ যখন বিধবা নারীকে বিয়ে করেন, তখন তিনি তাঁকে মেনে নিতে পারেননি। এমনকি অপর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ যখন ইংলন্ড গমন করেন, তখন তিনি তাঁকে ত্যজ্য পুত্র বলে ঘোষণা করেছিলেন। পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথের স্ত্রী কৃষ্ণভাবিনী যখন স্বামীর সঙ্গে ইংলন্ড গমন করেন, তখন অবশ্য তাঁদের শিশুকন্যা তিলোত্তমাকে নিজের কাছে রেখে দেন শ্রীনাথ। তিলোত্তমার বয়স তখন পাঁচ-ছয় বছর। কৃষ্ণভাবিনী 'ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা'র মতো গ্রন্থ লিখেছেন, সেখানে প্রকাশ করেছেন নারী প্রগতি সম্পর্কিত তাঁর চিন্তারাজি। ইংলন্ডে থাকাকালে সেদেশে পাশ্চাত্য নারীদের জীবনচর্চাকে প্রত্যক্ষ করে এদেশের অর্গলবদ্ধ স্বরূপের যন্ত্রণাকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, ঔপনিবেশিক দেশের প্রতিনিধি হিসাবে স্বাধীন ইংলন্ডকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তাঁর অন্তরে জাগ্রত হয়েছিল স্বাধীনতার স্পৃহা। তিনি স্বদেশে ফিরে এসে বিভিন্ন পত্রিকায় লিখেছিলেন মননঋদ্ধ প্রবন্ধ। 'শিক্ষিতা নারী', 'ইংরেজ মহিলার শিক্ষা ও স্বাধীনতার গতি, 'স্ত্রীলোক ও পুরুষ', 'স্ত্রীলোকের কাজ ও কাজের মাহাত্ম্য' প্রভৃতি প্রবন্ধে উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কারকদের মতো ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা এবং প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। অথচ, তাঁর কন্যা তিলোত্তমার বিয়েতে শ্রীনাথ দিয়েছিলেন রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয়। তিলোত্তমার দাম্পত্যজীবন সুখের হয়নি। তিলোত্তমার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছিল 'আক্ষেপ' কাব্যগ্রন্থ। সেখানে তিনি বাবা-মায়ের প্রতি অনুযোগ করেছেন বারংবার। কীভাবে পিতৃমাতৃস্নেহহীন মেয়েটি যন্ত্রণাদগ্ধ জীবন কাটিয়েছেন সেকথা বলেছেন সর্বদা। আবার বিবাহের পর স্বামীর ভালোবাসা পাননি, প্রবল কষ্টে ও যন্ত্রণায় তিনি স্বামীগৃহ ত্যাগ করেছিলেন। সেই মর্মস্পর্শী যন্ত্রণার কথা লিখেছেন কবিতায়। মায়ের মতো প্রগতিশীল চিন্তার শরিক হতে পারেননি, তাই স্বামীর পীড়ন সত্ত্বেও তাঁর প্রতি প্রথা মেনে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। প্রবল অন্তর-দহনে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মায়ের উদ্যোগে 'আক্ষেপ' কাব্যগ্রন্থ। সেখানে 'উচ্ছ্বাস' কবিতায় তিনি লিখেছেন :

> "বিবাহ করিল যবে প্রাণেশ আমায়।
> দ্বাদশ বৎসর গত, দু একদিন নয়।।
> দাসী বলি অবহেলি, দুই পদে দিয়ে ঠেলি।
> করিবে সুন্দরী মনে পুন পরিণয়।।
> এ বারতা মম মনে সত্য কি গো হয়?"

'আক্ষেপ' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশকালে কৃষ্ণভাবিনীও জীবনে কন্যাকে কিছু দিতে পারেননি বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন।

কৃষ্ণভাবিনীর লেখা প্রবন্ধ 'সাহিত্য', 'সাধনা' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এমনকি রবীন্দ্রনাথ যখন 'সাধনা'-র সম্পাদক, তখন কৃষ্ণভাবিনীর 'শিক্ষিত নারী'র প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধ বের হয়েছিল। তাছাড়া কৃষ্ণভাবিনী ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি ভারত স্ত্রী মণ্ডলের একজন সদস্য হয়েছিলেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বিধবাদের জন্য তিনি আশ্রম গড়ে তোলেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণভাবিনী-দেবেন্দ্রনাথের পরিবার সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন— এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। তিলোত্তমা তাঁর জীবনে যা পারেননি, রবীন্দ্রনাথের কন্যারা

Scanned with CamScanner

তাঁদের জীবনে যা পারেননি, এমনকি পিতা রবীন্দ্রনাথ বাস্তব জীবনে যা পারেননি ছোটগল্পকার তথা সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ শিল্পে সেই না পারার জগৎকে দেখাতে চেয়েছেন বিভিন্ন রচনায় এবং নিজের প্রগতিশীল চিন্তাভাবনাকে প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনেও তো এ চিত্রই পরিলক্ষিত হয়। পিতা রবীন্দ্রনাথ তাঁর কন্যার বিবাহ দিয়ে সুখী হতে পারেননি, শান্তি পাননি তাঁদের দাম্পত্য জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি করে। তিনি দেবেন্দ্রনাথের ট্রাস্টি থেকে অর্থ পাওয়ার জন্য কন্যাদের অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে দিতে বাধ্য হন। অথচ ঠাকুরবাড়িতে তাঁর দাদা সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা ইন্দিরার বিয়ে হয়েছে বেশ পরে। জ্যেষ্ঠ জামাতা শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, মধ্যম জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়— তিন জনকেই বিলাতে শিক্ষালাভ করার জন্য বিভিন্ন সময়ে অর্থের যোগান দিয়েছেন, এমনকি তাঁদের পরিবারের অপরাপর সদস্যদের মাসোহারা দিয়েছেন, কিন্তু প্রত্যাশিত ব্যবহার পাননি কারো কাছেই। শরৎচন্দ্র তাঁর মতো সম্মাননীয় মানুষের প্রতি অনীহা প্রকাশ করেছেন। কন্যা রেণুকা যখন অসুস্থ, তিনি যখন তাঁকে হাজারীবাগে নিয়ে গেছেন বায়ু পরিবর্তনের জন্য, সত্যেন্দ্রনাথকে দায়িত্ব দিয়েছেন আশ্রম বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষতার, তখন সে দায়িত্ব পালন না করে সত্যেন্দ্রনাথ গেছেন পাঞ্জাবে বেড়াতে, অসুস্থ স্ত্রীর জন্য সামান্য দায়িত্ব পালন না করেই। অথচ রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথকে বিলাত পাঠালে এবং সেখানে অ্যালোওপ্যাথি চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের গুঞ্জনে স্ত্রী রেণুকা সর্বাপেক্ষা আহত হয়েছিলেন। সে বিবরণ পাওয়া যায় মীরা দেবীর আত্মকথায়। অন্য দিকে কনিষ্ঠ কন্যা মীরার দাম্পত্যজীবন নিয়ে তাঁর বিবাহের পর থেকে সারা জীবনীব্যাপী বিপুলভাবে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নগেন্দ্রনাথের ব্যবহার, তাঁর চাতুর্য, মীরার প্রতি অবহেলা রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। অসহায় পিতা তাঁর যন্ত্রণাকে কখনো কখনো প্রকাশও করে ফেলেছেন নানা স্থানে, বিশেষত চিঠিপত্রে।

সুতরাং, রবীন্দ্রনাথের মতো প্রগতিশীল মানুষ যখন বাঙালি নারীর জীবন ও জগতের ক্ষেত্রে বাস্তবে প্রভূত সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতাকে প্রত্যক্ষ করেন, তখন শিল্পে তা থেকে উত্তীর্ণ হতে চান। বাস্তবে বাঙালি দাম্পত্যজীবনে সেদিন নারীপুরুষের ক্ষেত্রে ছিল অনেকখানি ব্যবধান। তার অন্যতম কারণ সেদিনের নারীদের স্বনির্ভরতার অভাব। বাঙালি মেয়েরা স্বনির্ভর হবে, তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ম্ভর হবে, সদরে পুরুষের মতো রোজগার করবে— এ ভাবনা আসতে সময় লেগেছিল অনেক দিন। এমনকি যাঁরা অনেকখানি শিক্ষিত নারী, তাঁরাও সম্পূর্ণভাবে তখন চাকরি করার কথা ভাবতে পারছেন না।

আসলে, অন্দরের নারীরা সদরে এসেছে এক প্রবল ধাক্কায়, সে ধাক্কা হল দেশ বিভাজনের ধাক্কা। ওপার বাংলা থেকে আসা পরিবারগুলি যখন স্বজন-স্বভূমি চ্যুত হয়ে এ বাংলায় টিকে থাকতে চাইছিল, তখন সেই পরিবারের নারীরা তাদের যাবতীয় প্রথা কিংবা সংস্কারকে উপেক্ষা করে বিয়ে নয়, চাকরি করতে চেয়েছিল। এজন্য অবশ্য তাদেরও কম গঞ্জনা সহ্য করতে হয়নি। ঘরে-বাইরে উপেক্ষিত হতে হয়েছে তাদের। ঘরের মানুষ ও প্রতিবেশীদের কাছে অনেক সময় সন্দেহের যন্ত্রণা কিংবা সংস্কারের পীড়ন সহ্য করতে হয়েছে আর সদরের পুরুষদের কাছে বিভিন্ন ভাবে অত্যাচারিত কিংবা লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। সেদিন নারীদের জীবনযন্ত্রণার প্রকাশ ঘটেছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর এক উঠান', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'চেনামহল', কিংবা সন্তোষকুমার ঘোষের 'কিনু গোয়ালার গলি'-র মতো উপন্যাসে এবং সে সময়ের কথাসাহিত্যিকদের বিভিন্ন ছোটগল্পে আর সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রায় এক দশক পরে। সেইসব দিনের প্রেক্ষিতে কিংবা সেই সব রচনার সাপেক্ষে রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' বিচার করলে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা কতখানি প্রগতিপন্থী! মৃণালকে তিনি বাইরে বের করেছিলেন, বাঙালি দাম্পত্য জীবনে নারী পুরুষের প্রবল ব্যবধান মৃণাল চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছে আর নারীর মর্যাদা পদে পদে কেমনভাবে লঙ্ঘিত হয় সেই দিকটিও সে দেখিয়েছে। এর মধ্যে শিল্পের ন্যায় লঙ্ঘন করে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার আর্তযন্ত্রণা কিংবা অভিমান প্রকাশিত হয়নি, কোথাও তা উগ্র হয়েও দেখা দেয়নি, উপরন্তু পরবর্তী সময়ের প্রেক্ষিতে তা তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে এবং শিল্পের সীমা লঙ্ঘন না করে সৌন্দর্যে অভিষিক্ত হয়েছে।

'স্ত্রীর পত্র' লেখার পরেও স্ত্রী-পুরুষের ব্যবধান এবং সংসারের পীড়ন যন্ত্রণার শিকার হয়ে নারীর আত্মক্ষয়ে প্রবৃত্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত বাঙালি সমাজে প্রায় সম সময়ে দেখা গেছে আরো অনেকের ক্ষেত্রে। যেমন অমিয়বালার উদাহরণই দেওয়া যায়। সমাজের যে বাধার কথাগুলি মৃণাল উচ্চারণ করেছে, প্রায় সেই অনুরূপ স্মৃতিচারণ করেছেন আধিপত্যের শিকার অমিয়বালাও। স্বামীর সঙ্গে কয়েক মাসের মধুময় জীবন অতিবাহিত করেছিলেন তিনি, সে স্মৃতি তিনি যন্ত্রণাপীড়িত দিনগুলিতেও ভুলতে পারেননি। কিন্তু স্বামীর যে আচরণ তাঁকে আহত করেছিল তা হল তাঁর অবহেলা। বোঝা যায়, এ অবহেলা সেদিন তার প্রতি ছিল না, এ অবহেলা ছিল প্রথাবদ্ধ সমাজে পুরুষের নারীর প্রতি। তাই দেখি স্ত্রীর অসুখে স্বামী প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন না, তাঁর আত্মীয়দের কাছে এ নিয়ে কুৎসা রটান। অমিয়বালার মনে হয়েছে, এ কোন্ পৌরুষের প্রকাশ? অমিয়বালার লেখায় ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সচেতনতা, তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, তাঁর মর্যাদাবোধ। অমিয়বালা স্বামীর গৃহ থেকে চলে এসেছেন পিতৃগৃহে,

Scanned with CamScanner

কিন্তু আত্মসম্মানবোধকে বিসর্জন দিতে পারেননি। মাত্র উনিশ বছর বয়সে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। পত্রিকায় যে স্মৃতিকথা তিনি লিখে গেছেন তাতে দেখা যায়, তাঁর প্রতিভার ক্ষণিক দীপ্তিকে। তিনি কবিতা লিখতে পারতেন তা বোঝা যায়। এদিক দিয়ে মৃণালের চরিত্রের সঙ্গে তাঁর সাযুজ্য অনুভব করা যায়। সুতরাং দেখা যায়, আধিপত্য-পীড়িত সমাজব্যবস্থায় মৃণাল কোনো আরোপিত চরিত্র নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাবনা কতখানি ভবিষ্যৎমুখী তা বোঝা যায় মৃণাল চরিত্র নির্মাণের পরেও প্রায় সমরূপ চরিত্রের দেখা বাস্তবে মিলেছে— এই অনিবার্য সময়-সত্য থেকে।

রবীন্দ্র-সমসাময়িক সেকালের সমালোচক এবং রবীন্দ্র-পরবর্তী একালের সমালোচকরা 'স্ত্রীর পত্র' গল্প সম্পর্কে বেশ কিছু অভিযোগ করে থাকেন। সেই অভিযোগের একটি অন্যতম দিক হল নীলাচলে গিয়ে মৃণাল স্বামীর বিরুদ্ধে পত্র লিখে বিদ্রোহ করেছে; তাঁদের মতে সেই বিদ্রোহের সারবত্তা কতখানি, কেননা এর পর মৃণালের দিন অতিবাহিত হবে কীভাবে? এর উত্তরে বলা যায়, একথা ঠিক তখনও বাঙালি নারীরা স্বনির্ভর হয়নি, কিন্তু তাই বলে একেবারেই যে কেউই আত্মপ্রতিষ্ঠিত হননি, তা নয়। প্রসঙ্গত এর বহু পরে লেখা আশাপূর্ণার 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের উপসংহারের কথা বলা যায়। প্রায় একই পটভূমিতে লেখা এবং প্রায় একই সিদ্ধান্ত নেওয়া আর এক নারী সুবর্ণ নবকুমারের কাছে থেকে দূরে সরে যায় এবং মনে করে যে সে শিক্ষকতা জুটিয়ে নিতে পারবে। রবীন্দ্রনাথ মৃণালের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলেননি, তিনি কেবল মীরার প্রসঙ্গ তুলেছেন। মৃণালের জীবনভাবনা থেকে আমরা, পাঠকেরা অনুভব করতে পারি, সে অধ্যাত্মজীবনের ক্ষেত্রটিতে নিজেকে সমর্পণ করবে না। আশা করা যায়, সুবর্ণের মতোই ছেলে মেয়ে পড়ানোর কাজ জুটিয়ে নেবে। তাছাড়া যে মেয়ে অসাধারণ শিল্প গুণসম্পন্ন পত্র লিখতে পারে; অসামান্য বিদুষী, গুণবতী এবং বুদ্ধিমতী সে সম্মানের সঙ্গে অন্নবস্ত্র জুটিয়ে নিতে পারবে আশা করা যায়। সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, ভারত স্ত্রী মণ্ডল অনেক আগেই কেশবচন্দ্র গড়ে ছিলেন। উড়িষ্যায় অনেক বাঙালি নারীও বাইরের জীবনের অংশীদার হয়ে নানা কাজ করছিলেন। বিধবাদের জন্য বিভিন্ন আশ্রমও নানা জায়গায় নির্মিত হয়েছিল, সে সব আশ্রমের দেখাশোনাও মেয়েরাই করতেন। উদাহরণ হিসাবে সুদক্ষিণা সেনের কথাই বলা যায়। তিনি বিভিন্ন সময়ে প্রগতিশীল কাজকর্ম করেছেন, ইতোপূর্বে উল্লেখিত কৃষ্ণভাবিনীও এ সবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সুতরাং মৃণালও সেরকম কোনো কাজকর্ম করবেন বলেই মনে হয়। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন তাঁর দিদিকে অর্থাৎ স্বর্ণকুমারী দেবীকে; তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা, ইন্দিরা কিংবা ভাগ্নি হিরন্ময়ী, সরলা প্রমুখকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন; দেখেছিলেন তাঁরা কতটা

Scanned with CamScanner

কর্মময় জীবনের অংশীদার। তিনি বিদেশ ভ্রমণকালে নারীদের দেখেছিলেন, বিদেশের সাহিত্যের স্বনির্ভর নারী চরিত্রও তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। সুতরাং স্বপ্নের ভুবনকে তিনি শিল্পে অঙ্কন করেছিলেন এবং সে শিল্পের ভুবন আবার পরবর্তী বাস্তবের জগতে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গত কৃষ্ণভাবিনীর একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা যায়, সেখানে তিনি লিখেছেন :

> "ইংলন্ডে প্রায় আজকাল অধিকাংশ, ভাল-মন্দ সব রকমের উপন্যাসগুলিই নারীরচিত। ঐ সব স্ত্রী গ্রন্থকর্ত্রীদের মধ্যে বর্তমানে মিসেস্ অলিফ্যান্ট, মিস্ থ্যাকারে, মিস্ ব্র্যাডুন প্রভৃতি কয়েকজন অতি প্রসিদ্ধ। আর মৃত মহিলা লেখিকাদের মধ্যে জর্জ এলিয়ট, মিস ব্রুট, মিসেস ক্রেক্ ও মিস্ অষ্টিন অত্যন্ত বিখ্যাত ছিলেন। এই সব গ্রন্থকর্ত্রীরা উপন্যাস লিখিয়া যে কত উপার্জ্জন করেন ও করিয়া গিয়াছেন, তাহা শুনিলে হয় ত আমাদের প্রত্যয় হয় না। কিন্তু, ইংলন্ডে ও আমেরিকায় উহা সচরাচর ঘটিতেছে। উঁহারা এক একখানি নভেল লিখিয়া, অন্তত ১০,০০০ টাকা পাইয়া থাকেন, আর ঐ সকল উপন্যাস-লেখিকারা বৎসরে দু'খানার কম পুস্তক না লিখিয়া ছাড়েন না সুতরাং শুধু কলম চালাইয়া, গড়ে তাঁহাদের অন্তত ১,৫০০ টাকা মাসিক আয় হয়! ঐ সব বড় লেখিকা ছাড়া যে কত মাঝারী ও ছোট রকমের গ্রন্থকর্ত্রী আছেন, তা' বলা যায় না, তাঁহাদের নাম ও পুস্তকের গুণানুসারে, তাঁহাদের উপার্জ্জনের তারতম্য হয়।"

সুতরাং, এ স্বপ্ন কৃষ্ণভাবিনী দেখেছেন যে, এদেশের নারীরা সুশিক্ষিত হলে কোনো না কোনোভাবে ভদ্র ও শোভন উপায়ে উপার্জ্জন করতে পারবে। রবীন্দ্রনাথও এই মত পোষণ করতেন বলে ছোটগল্পের পরিমিত সংরূপে মৃণাল কীভাবে দিন অতিবাহিত করবে— সে চিত্র বাহুল্য বলেই মনে করেছিলেন এবং ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে ফলপরিণামটিকে পরিবেশন করে পাঠকের কাছে সেই সহৃদয় বিবেচনা প্রত্যাশা করেছিলেন। আমরা, পাঠকেরা আশা করতে পারি পুরী তথা উড়িষ্যার বাঙালি মার্জিত সমাজে সুদক্ষিণাদের মতো মৃণালও সম্মানের সঙ্গে জীবনধারণ করবে, সকলের মান্যতা ও শ্রদ্ধা পাবে, সে লেখক হিসাবে হোক, কিংবা শিক্ষক রূপেই হোক।

Scanned with CamScanner